নাভারনের বানুফু'র বার্ডেন অফ প্রুফ

দিলরুবা শাহানা

চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। চিঠিতে তিনটি সংবাদ রয়েছে। দু'ধরনের সংবাদই রয়েছে। তবে স্বস্থিকর হল যে সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ দু'টোই বেশ পুরোনো। আমাকে খুঁজে পেতেই সংবাদদাতার অনেক বছর চলে গেল যে। টাট্‌কাতাজা খবর দেবে কিভাবে? সুসংবাদ দিয়েই শুরু করা যাক তবে। যশোরে নাভারন নামে একটা জায়গা আছে। সেই নাভারনের বাসিন্দা বানুফু'। যিনি একটি কাঠবাগানের মালিক। ফুলবাগান, ফলবাগান বা সব্জীবাগান নয় কাঠবাগান। ব্যাপার আজব বলে মনে হতে পারে তবে আসলে তা সত্যি। শাল, সেগুন, মেহ্‌গনী ছাড়াও আরও হরেক রকম মূল্যবান গাছে ছাওয়া বানুফু'র কাঠবাগান। সুসংবাদ হল যে, নাহ্ থাক এই সুসংবাদটা সবশেষে পরিবেশিত হবে। আমাকে বিস্মিত করেছে, আপ্লুত করেছে এই সুসংবাদ।

দ্বিতীয় সুসংবাদ বানুফু'র স্বামীর আত্মীয়রা যে মামলাটি তার বিরুদ্ধে করেছিল তাতে ওরা হেরে গেছে। ফল যা তা হল বানুফু' ঐ সম্পত্তিরও বেশকিছু অংশের মাল্‌কিন এখন।

দুঃসংবাদ হল মামলা জেতার বছর না ঘুরতেই বানুফু' পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

খবর জানিয়েছে বানুফু'র একমাত্র ভাইয়ের একমাত্র ছেলে মির্জা নাজিম খান। সন্তানহীনা শাহবানু খানম মির্জা নাজিমের ফুফু। সেই সূত্রে আমিও উনাকে ফুফুই ডেকেছি। যদিও তারসাথে জীবনে একবারই দেখা হয়েছিল তার টং বা মাচার উপর সেগুনকাঠের তৈরী বারান্দাঘেরা অপূর্ব একঘরে।

গল্পটা কিসের নিজেই বুঝতে পারছিনা। শাহবানু খানমের গল্প। যার একটি পা অন্যটি থেকে সামান্য ছোট ছিল। নাকি আইনের একটি নীতির। নীতিটি হচ্ছে অভিযোগ যে করবে প্রমাণের দায়িত্ব অর্থাৎ বার্ডেন অফ প্রুফ তারই কাঁধেই বর্তায়। বানুফু'র মামলায় এই নীতির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আদালতে হারার পরামর্শ দিয়েছিলাম। উকিল যদিও অন্যজন ছিলেন। তবুও উনি আমার অনেক কষ্টে খুঁজে কেইস ল বের করার পারঙ্গমতায় বিস্মিত হয়ে তাতে গভীর আস্থা বা ভরসা রেখেছিলেন।

আইন ব্যাপারটি জটীল। তবে আইন ঘাটলে মানুষ যে কি সাংঘাতিক ধুরন্ধর প্রাণী তা দেখে বিস্ময় লাগে। তখন মনে হয় দস্তয়ভস্কির কথাই ঠিক 'মানুষ বড় জটীলপ্রাণী'।

নাহলে সামান্য রাগ করে বানুফু' যখন বাপের(আসলে বাবা তখন আর বেঁচে নেই, আর মেয়েদের নিজের বলে কোন বাড়ীতো নেই তাই বলা যায় ভাইয়ের) বাড়ী ফিরে এলেন তখন দেবর এসে বলে গেল
'দাদাভাই তোমাকে মুখে তিন তালাক উচ্চারণ করে তালাক দিয়েছে, ফেরার আর উপায় নাই তোমার'।
হতভম্ব বানুফু'র বিশ্বাস করতে মন চাইছিলনা প্রথমে। পরে কঠিন নীরবতার আবরণে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। সামান্য খুঁড়িয়ে হাটার কারণেই বানুফু' বিয়েই করবেননা ঠিক করেছিলেন বা তার বিয়ের প্রস্তাবও পছন্দসই আসছিলনা। তার স্বামী পরিবারের বড়ছেলে। মা-বাবাহীন সংসারে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করে তাদের বিয়েশাদী দিতে দিতেই সময় চলে যায়। নিজের বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ডাক্তারের প্যাথলজীতে বানুফু'কে দেখে আগ্রহ জাগে। হাল্কাপাতলা গড়ণ, গৌরবর্ণ, লম্বাচুল, বাঁশীর মত খাড়া নাক সাতাশবছরের খুঁড়িয়ে হাটা বানুফু'কে অনেক নিশ্চয়তা ও গভীর ভালবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘরে তুলে আনেন। ভদ্রলোকের ভাইবোনেরা এতো বয়সে দাদাভাইয়ের বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। তার উপর দেনমোহর হিসেবে বাপের বাড়ীর কাঠবাগান বানুফু'র নামে কিনে দেওয়া, ঢাকা থেকে ফরমায়েশ দিয়ে একপায়ের জন্য সমান্য উঁচু স্যান্ডেল বানিয়ে আনানো ইত্যাদি ভাইবোনদের আরও অপছন্দনীয় হল। খুশী হল তখনি যখন বানুফু'র কোন ছেলেপুলে হলনা। সাতবছর পার হয়ে গেল। স্বামী ছিমছাম সাদামাটা মনের মানুষ। কখনোই কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করতেননা। বানুফু'রই অভিমান ছিল বেশী। অভিমানী হবেন নাইবা কেন? এমনিতেই জন্মসময়ে স্রষ্টা একটি পা ছোটকরে কি নিষ্ঠুর এক ঠাট্টা বানুফু'র সাথে করেছেন। তারপর ভালমানুষ স্বামী পাওয়ার পরও সন্তান দিচ্ছেননা। বানুফু'র অভিমান স্বামী বুঝলেও ভাইবোনরা বুঝতোনা। স্বচ্ছল ব্যবসায়ী ভাইয়ের জীবনে প্রায় পঙ্গু নারীকে মনে মনে তারা কখনোই সহানুভূতির চোখে দেখেনি।
মির্জার বউ শামা আমার বান্ধবী। সেই সূত্রে মির্জাও বন্ধুরই মত। তবে অমায়িক ও নম্রভাষী মির্জা মিতবাক, সংযমী। শামারা যশোরের নাভারন যাচ্ছে বানুফু'র মামলার বিষয়েই কথাবার্তা বলতে। আমি কাজে যাচ্ছি শুনে শামা খুব জোরকরে ধরলো নাভারনে ওর শ্বশুড়বাড়ী ঘুরে যেতে। প্রথমে যেতে মোটেও আগ্রহী ছিলামনা। তবে শামার কাছে বানুফু'র মামলার কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে দু'দিনের জন্য নাভারনের অতিথি হলাম।
মামলা গতানুগতিক। বানুফু'র স্বামীর ভাইবোনেরা মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ বানুফু'র স্বামী বানুফু'কে তালাক দিয়েছেন অনেক আগেই সুতরাং বানুফু' মোটেই তার উত্তরাধিকারী নন। উনি কোন সম্পত্তিই পাবেননা।
জেলাজজের আদালতে বানুফু'র পক্ষের উকিল হেরে গেছেন। তার পক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় যে তালাক হয়নি। এই হারাটাই আমার কাছে মনে হল জেতার সোপান। তবে বানুফু'র পক্ষকে হাইকোর্টেও হারতে হবে। ঐ পক্ষ অবশ্য তালাক যে হয়েছে তার কোন লিখিত দলিল দেখায়নি। তাদের এককথা বানুফু'র স্বামী

মুখে তালাক দিয়েছিলেন বলেই বানুফু' স্বামীর মৃত্যুরও তিনবছর আগেই সেই যে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছিলেন, আর ফিরে আসেননি।

মির্জাদের বাড়ী গিয়ে অবাক হলাম বানুফু'র কাঠের সুন্দর বাসগৃহ দেখে। অন্য ঘরদুয়ারও সম্পদের চাকচিক্যে নয় তবে রুচিবোধের স্বাক্ষরে উজ্জল ছিল। সামনেই আঙ্গিনা পেরিয়ে টিনের ছাদের পাকা বাংলাঘর বা বৈঠকখানা। এরপরে একপাশে ফুল ও অন্যপাশে শাকসব্জীর বাগান। তারপরই দোতলা বসতবাড়ী। ঐ দোতলার কাছাকাছি বানুফু'র কাঠের ঘর। লোহাকংক্রীটের মজবুত খাম্বা বা পিলারের উপড় দোতলার চেয়ে সামান্য নীচুতে কাঠের পাটাতনের উপর চারদিকে বারান্দা ঘেরা সম্পূর্ন কাঠের ঘর। দোতলার বারান্দা থেকে কাঠের সিড়ির সাঁকো দিয়ে বানুফু'র বারান্দায় পৌঁছা যায়। কাঠের ঘরে যাওয়ার ঐটাই পথ। দোতলার একটি ঘর স্থানীয় সংস্থায় কাজ করে শিক্ষিত শহুরে দু'টি মেয়েকে ভাড়া দিয়েছেন। বৈঠকঘরটিও ওরা সময়ে সময়ে মেয়েদের কিসব প্রশিক্ষণে ব্যবহার করে। বানুফু' বাড়ীতে একেবারে একা নন।

শহরের ইট ও লোহার খাচায় বসবাসকারী প্রাণী আমি। আমার জুতার হিল প্রতিনিয়ত কংক্রীটে দাপটের শব্দ তুলে ঠিকই তবে সে পা কাদা বা ঝরা পাতার নরম আদুরে ছোঁয়া পায়নি কখনো । স্বাভাবিকভাবেই মুগ্ধ কাঠের ঘর ও লাগোয়া প্রকৃতির অবারিত দান কাঠবাগানের অপূর্ব বৈভব দেখে।

যাহোক আমার বেড়ানোর পেছনে কারণ ছিল। তা হল দু'দিনে যতোটুকু সম্ভব স্থানীয় কিছু সংস্থা থেকে বানুফু'র মামলার স্বার্থে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। পৌঁছেই কাঠের ঘর দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘোষণা দিলাম আমি কাঠের ঘরে থাকবো। বানুফু' খুশী হলেন কিনা বুঝলামনা। তবে শামা আড়ালে উনার কান বাঁচিয়ে বললো

'ভাগ্যিশ আপত্তি করেননি, যা রুক্ষ মানুষ উনি, যদিও মির্জা আল্লাদ করে বলে ফুফু খুব দুঃখীতো তাই অভিমানে অবুঝ'

প্রথমদিন প্রায় তেমন কথাবার্তাই হলনা। ছাদ থেকে মোটা লোহার আংটায় ঝুলানো দড়ির দোলনা, বেতের চেয়ার, কাঠের টেবিলে ছোট্ট টিভি। কাঠের চমৎকার নকশাকাটা আলমারী। আর রয়েছে কাঠের মেঝেতে বড় বিছানা পাতা। দোলনাটা দেখেই আমার বসে বসে খানিকটা দুলতে ইচ্ছা করলো। তবে শামার কথাটা মাথায় ছিল বলে নম্রভাবে আবেগ ঢেলে বললাম

'ফুফু! এখানে বসবো একটু?'

'বস'

আমি বসেই আয়েস করে আস্তে আস্তে দুলছি আর জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি। কাকতালীয় ভাবে ভাগ্য প্রসন্ন তাই রাতটি ছিল পূর্ণিমার। বাইরে অবিরল চাঁদের আলো ঝরছে। গাছের পাতায় পাতায় বেয়ে বেয়ে সোনারং উপচিয়ে নামছে। যেখানে আলো পৌঁছায়নি সেখানে আধাঁরের ছোঁয়া। তাতে তৈরী হয়েছে অলৌকিক, অপার্থিব এক ছবি। এমনি রূপ যা দেখে দেখে মরেও সুখ আবার অনন্তকাল বেঁচে

থাকতেও স্বাদ জাগে। উনি যেন আমাকে মুগ্ধতার নেশা থেকে জাগানোর জন্য গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন

'তুমি আমার মামলার জন্য কি সব কাজ নাকি করবে, কালকে সকালে কখন বেরোবে?'

'আটটায়, মির্জাই নিয়ে যাবে'

'আস তবে ঘুমাবে।'

'পশ্চিম কোনদিকে ফুফু?'

মুখে কিছু বললেননা আঙ্গুলের ইশারায় শুধু দিক নির্দেশনা।

নতুন বালিশ, চাদর আর মার্কিন কাপড়ে যশোরষ্টীচের চমৎকার উষ্ণকোমল কাঁথা। সবকিছুতেই যেন আদর মাখিয়ে রাখা। ঘুম হল অদ্ভুত আমেজের।

চোখ মেলে খোলা জানলায় দিয়ে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় সকালের রোদ নেচে বেড়াচ্ছে। বানুফু' আগেই উঠে চলে গেছেন। দেখি চেয়ারের হাতলে জায়নামাজ রাখা। গতরাতের প্রশ্নের উত্তরে কথা খরচে কিপ্‌টেমী করলেও নীরবে প্রয়োজন মিটিয়েছেন। পাকপবিত্র হয়ে নামাজ শেষে প্রার্থনা ফুফুর কাজগুলো যেন সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়। মনে পড়লো মির্জার কাছে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছি যা পরবর্তী কাজের জন্য দরকার। ওর সহজে কোন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বোঝা যায়না। আমারও স্বভাব কাউকে একবারের বেশী কোনকথা বলিনা। মির্জাকে একই কথা আবারও বলতে হবে ভেবে অস্বস্থি লাগলো। তৈরী হয়ে নাশ্‌তার টেবিলে বসতেই মির্জা একটি কাগজ এগিয়ে দিল। তাতে সুন্দর করে আমার জানতে চাওয়া বিষয়গুলো লেখা। বুঝলাম বাইরে তাপউত্তাপ বা হেলদোল না থাকলেও মির্জা কাজের বিষয়ে নীরবে গুছানো ও আন্তরিক।

ময়দার গরমগরম ফুল্‌কো রুটি, ডিমের অমলেট, চিকন করে পলা আলুভাজি আর যশোরের কাচা ছানা দিয়ে নাশ্‌তা সেরে কাজে যাত্রা। বোতলে পানি, ফ্লাস্কে চা দিয়ে দিলেন ফুফু।

মির্জার কোম্পানীর এসি লাগানো জিপে সারাদিন কাজী অফিস থেকে ভূমি অফিস কয়েকটিতে ঘুরাঘুরিতেই গেল। সময়ে কুলাচ্ছিলনা বলে পরদিনের জন্য কিছু কাজ বাকী রেখে ফিরতে হল।

ফিরে গোসল সেরে খেয়েদেয়ে কাঠের ঘরে গিয়ে কাগজপত্র ফাইলে গুছিয়ে রাখার পর শামার প্রশ্ন

'কিরে যা খুঁজছিস তার কোন হদিস পেলি?'

'এখনো সব জায়গায় যেতে পারিনি কালকের অভিযানের পর কিছুটা হলেও বুঝতে পারবো ।'

পরদিন পাখীর মাংশের ভূনা, পরোটা আর খেজুরগুড়ের পায়েস খেয়ে মির্জা আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা হল। ছোট্ট টেপ রেকর্ডারে চেয়ারম্যানের বক্তব্য নথিবদ্ধও করা গেল।

চেয়ারম্যানকে দেখে চমৎকৃত হলাম। স্বশিক্ষিত, সৌম্য, মাঝবয়সী দাড়িওয়ালা এই মানুষটির মত প্রতিটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হলে দেশের চেহারাই হয়তো অন্যরকম

হত। দেশের উন্নতির জন্য শুধু শিক্ষিত ব্যুরোক্র্যাট-টেকনোক্র্যাট নয় সাথে দরকার তৃনমূলে এমন জনসেবকও। তিনপুরুষ ধরে চেয়ারম্যান এই পরিবার। আমার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নথিপত্র খুলে ভদ্রলোক দেখালেন যে বানুফু'র স্বামী মীর আকমল আলী কখনোই তালাকের কোন নোটিশ তাকে পাঠাননি।

ভদ্রলোক অতিথি আপ্যায়নও করলেন পরিমিত আচারে। তোষামুদী বা বিগলিত হওয়া জনপ্রতিনিধির বৈশিষ্ট্য নয় একটি কথায় বুঝিয়ে দিলেন,

'আপনারা রাজধানীর জজকোর্ট-হাইকোর্টে আইন নিয়ে লড়াই করছেন করুন তবে সাধারন জনজীবনের আইন বিষয়ে কাজী, ইউপি চেয়ারম্যান মেম্বারদেরকে সচেতন করা খুব দরকার। অনেক ছোটখাটো হুজ্জতি তখন এড়ানো যাবে।'

মনে হল ভদ্রলোক সঠিক কথাই বলেছেন। তার সচেতন পর্যবেক্ষন ১৯৬১র আইনের দীর্ঘ সাতাশ বছরে পরও মানুষ জানেনা যে তালাকের জন্য প্রথম নোটিশ পাঠাতে হবে এলাকার চেয়ারম্যানকে। তারও নব্বইদিন পর কাজীর কাছে রেজিষ্ট্রী করতে হবে। মানুষ এখনও ভাবে মুখে তালাক তিনবার বললেই তালাক হয়ে যায়। যাক্‌গে চেয়ারম্যানসাহেব হাদিসকোরানে ও তথ্যজ্ঞানে আলোকিত মানুষ।

তবে উনি জানেননা যে তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের সময়ের তৈরী গণমুখী আধুনিক অনেক আইনের বিধান উনসত্তর বছর পরও তৃনমূলে পৌঁছায়নি। কথায় আছে কুকথা বাতাসের আগে রটে আর আমার মনে হয় সুকথার বোধহয় মৃত্যু ঘটে। শেষে দোয়া করলেন

'আপনি ঠিকপথে আগাচ্ছেন আপনার কাজে জয় আসবে।'

ভদ্রলোক জানেনও না কি কাজে এই তথ্য সংগ্রহ। বলেছি গবেষণা। তবুও আমার কাজে তার শুভকামনায় মনটা খুশীতে ভরে গেল।

ফেরার পথে প্রথমবারের মত মির্জা জানতে চাইলো

'কাগজপত্র দেখে কি মনে হচ্ছে মামলা বানুফু'র পক্ষে যাবে?'

'আজরাতে বানুফু'র সাথে কথা বলার পর পুরো বিষয়টা বুঝবো।'

সে রাতে বানুফু'র সাথে ভালই কথা হল। একটি তথ্য আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হল যা ওই পক্ষের অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারে। তবে যে তথ্যটি তারা সম্পূর্ন চেপে গেছে তা হল তিনবছরে কতবার স্বামী বানুফু'কে আনতে গেছেন, বানুফু'র নামে একাউন্ট খুলে প্রতিমাসে টাকা রেখেছেন। তালাকই যদি দিয়ে থাকতেন তবে এসব কেন করেছেন?

বানুফু' ব্যাংক একাউন্টের সব কাগজপত্র, সেইসাথে স্বামীর ডাকে পাঠানো স্বামীরই নাম ও স্বাক্ষরসহ ডিপোজিট স্লিপও আমাকে দিয়ে দিলেন । বল্লাম

'কেন যাননি ফিরে তার কাছে?'

'দোষ আমারই, এমনই বদনসীব আমার! ভালমানুষ স্বামীকেও ভুল বুঝে কষ্ট দিয়েছি, জান তার কাছ থেকে আসা চিঠিও খুলে দেখিনি। দারুন অভিমান আমার!'

কিছুটা সময় পাথর হয়ে বসে থেকে বললেন

‘তার মৃত্যুর পর একে একে খাম খুলে ডিপোজিট স্লিপগুলো যখন পেলাম তখন ভুল শোধরানোর কোন উপায় আর ছিলনা। আপন মানুষকে দুঃখ দেয়ার জন্য নীরব হয়ে যেওনা কখনোই, কথা বলে ভুলের জটা খুলবে।’
তারপর বানুফু’ জিজ্ঞেস করলেন
‘তুমি যে বন্ধুর ফুফুর উপকার করতে ছুটে এসেছ এতে তোমার স্বামী কি বলে?’
‘ফুফু সে যদি আমাকে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখার মতই আদরে যত্নে রাখতো তবে আমি খুব অসুখী এক মেয়ে হতাম বোধহয়, ও আমার কাজকেও সম্মান করে তাই...’
‘তোমাদের সময়টাই অন্যরকম, তোমরা শিক্ষিত মেয়েরা নানা কাজে জীবনকে অর্থময় করে তোল আর আমাদেরটা ব্যর্থ বলা যায়!’
‘না না তা কেন হবে, এই যে আপনি কাঠবাগান গড়ে তুলেছেন এটাতো বিরাট স্বার্থকতা, গাছের ছায়ায় এসে ক্লান্ত মানুষ যখন প্রশান্ত হয় সেই প্রশান্তির কিছুটা দোয়ার মত যিনি গাছ লাগিয়েছেন তার উপরও এসে পড়ে৷ আমার এক চাচা বারোয়ারী রাস্তাতেও গাছ লাগাতেন আর আমাদের একথাগুলো বলতেন’
‘সত্যি বলছো? তবে বলা হয় গাছের পাতা আল্লার জিকির করে তাই গাছ লাগালে সওয়াব হয়, তবে তোমার চাচার যুক্তিটিও ভারী সুন্দর। এবার বড়বড় সেগুনগাছ কাটিয়ে কাঠ সিজন করাচ্ছি মির্জার ঢাকার নতুন ফ্লাটের দরজা-জানালা, ফার্নিচারের জন্য, ওদেরকে বলিনি বিষয়টি। শামা বাড়ীর সেগুনকাঠ দিয়ে ফার্নিচার বানাতে চেয়েছিল আমি ‘হ্যা’ ‘না’ কিছুই বলিনি। ও বোধহয় কষ্টই পেয়েছে তাতে,’
এই খবরে শামার আনন্দিত মুখ কল্পনা করে উনাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সাহস হলোনা। ভীষন রাশভারী আর অন্তর্মুখী মহিলা। বললাম
‘আপনার কাঠের বাড়ীতে আমি স্বামীবাচ্চা নিয়ে বেড়াতে আসবো। ওরাও বিশাল সব গাছ দেখে খুশী হবে।’
কিছু না বলে আমার চোখের দিকে মনোযোগ দিয়ে একটু দেখলেন। হয়তো কথাটা কোন অতল থেকে উঠে এসেছে তা মাপলেন। একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলে পরে বললেন
‘ভেবে কুল পাইনা মানুষ এতো হীন, স্বার্থপর হয় কেমন করে?’
‘এমনও মামলা দেখেছি ফুফু, বিধবা মাকে বাবার দু’আনা সম্পত্তি যা সত্তর লাখ মূল্যের তা থেকে বঞ্চিত করার জন্য পেটের ছেলে নকল তালাকনামা বানিয়ে মামলা করেছে যে মা সম্পত্তির কিছুই পাবেনা। কারন মৃত্যুর আগে বাবা মাকে তালাক দিয়েছে। ঢাকার শিক্ষিত উচ্চবিত্ত মানুষ এরা।’
ফেরার পথে মির্জা শামাকে বললো
‘বানুফু’ চারটে গাছ প্রাইমারী স্কুলকে দিয়েছেন আর দু’টো গাছ জয়া আর অর্জুনকে দেবেন ওদের বিয়েতে। নতুন সংসারে আসবাবপত্র বানাতে’
শামা বললো

‘হ্যা ফুফুইতো অসিতকাকাকে অর্জুনজয়ার বিষয়ে রাজী করিয়েছেন। ভালই হবে জয়ার বাবাও নাই৷ দু’টো ভাড়াটে মেয়েই ফুফুকে ভালবাসে, নাইমা বোধহয় স্বামীর সঙ্গে বিদেশ চলে যাচ্ছে।’
‘অর্জুন ফুফুর অনেক কাজ করে দেয়। দেখলেতো কাঠ সিজন করানোর কতবড় চৌবাচ্চা বানিয়ে দিয়েছে অর্জুন। ভাল যে বুয়েট থেকে পাশ করে ও খুলনা বিআইটিতে পড়াতে এল। অসিতকাকাকে বাবা আর ফুফু ছোটভাইয়ের মত দেখতেন। অর্জুনও কাছে আছে বলে ভাইয়ের ছেলের মতই দায়িত্ব পালন করে। অসিতকাকার বাবাচাচারা আমার ওপার বাংলা থেকে সম্পত্তি অদলবদল করে আসা দাদাকে সহযোগীতা ও সম্মানের সাথে এদেশে সুস্থির হয়ে বসতে সাহায্য করেছেন’
‘এতো কাঠ সিজন করিয়ে উনি করবেনটা কি বলতো?’
‘জানিনা, জিজ্ঞেসও করিনি যদি আবার রেগেটেগে যান’
আমি তখন গোপন রহস্য খুললাম। শামা খুব খুশী হল। মির্জা উজ্জল মুখে বললো
‘দেখেছো ফুফু কেমন নীরবে কাজ করে!’
আমি বললাম
‘তোমার নামের রহস্যও ফুফুর কাছ থেকে জানা হল’
শামা জিজ্ঞেস করলো
‘কি রহস্য কি রহস্য?’
‘শুন মির্জার দাদা দুই কবির নামের অংশ নিয়ে ওর নাম রাখেন’
মির্জা হেসে বললো
‘মির্জা গালিব আর নাজিম হিকমত!’
‘আশ্চর্য আমি জানতাম না’
‘শামা, মির্জাও যে তার ফুফুর মতোই নীরব থাকে আর গোপন রাখে।’
কথাগুলো নিয়ে হাসলাম আমরা সবাই।
তারপর কেটে গেল কতবছর। হাইকোর্টেও বানুফু’র মামলায় হার হল। বারবারই বানুফু’র পক্ষের উপর চাপ আসছিল তালাক হয়নি তা প্রমাণের। অথচ বার্ডেন অফ প্রুফ ছিল ওই পক্ষের দায়িত্ব। সুপ্রীম কোর্টে আপিল করা হল। বিশ্বাস ছিল এবার নীতির নিরিখে জিত হবেই।
যোগাযোগ ছিলনা মাঝে। তারপর এই চিঠি। বানুফু’র কাঠের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া হয়নি আর। মির্জা লিখেছে উনি নিজ খরচে সরকারী রাস্তার তিন মাইলের দু’পাশ জুড়ে মেহগনী লাগিয়েছিলেন যা এখন বড় হয়ে প্রাকৃতিক তোড়ণ তৈরী করেছে। আরও লিখেছে উঁনার প্রত্যাশা ছিল আমি সপরিবারে কোন একদিন তার বাড়ী বেড়াতে যাব। শামা লিখেছে এবার গেলে গাছে ছাওয়া তোড়ণ পেরিয়ে বাড়ী ঢুকতে হবে। ব্যর্থ কি উনি? মোটেও না। ক’জন পারে সবার জন্যে ভালবাসার এমন সবুজ প্রাণবন্ত উপহার রেখে যেতে!

ওহ! হো আসল খবর হল আমার কাঠপ্রীতি মনে রেখে উনি আমার জন্য গাছ উপহার রেখে গেছেন। মির্জা লিখেছে বানুফু' ওঁর বাগানের গাছ থেকে অনেক পুরোন দু'টো শাল বা সেগুনগাছ আমার জন্য উপহার হিসেবে দিয়ে গেছেন।
এ এক দারুন উপহার। তবে আমার বাস এখন শূন্যতার মাঝে। কাচের ঘরে। কাঠের ঘর যে অনেক দূরে। ধরাছোঁয়ার বাইরে।